যুগান্তর

তারিখ ... 24 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম 6

আলোকিত ঢাকা কলেজ কি ঢেকে যাবে অন্ধকারে?

শতফুল ফুটতে দাও

ড. মাহবুব উল্লাহ্

শৈশবে-কৈশোরে ও যৌবনে পদার্পণ করতে গিয়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণ করেছি, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সেসবের কথা ভেবে আজও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল গ্রাম ও শহরে। এখনও স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে প্রায়ই ইচ্ছা হয় আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একবার ঘুরে আসি। জীবনের সময় যত পার হয়ে যায়, মানুষ ততই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন আঁকা জায়গাগুলো দেখতে ইচ্ছা পোষণ করে। এ ইচ্ছা কখনও কখনও সুতীব্র হয়; কিন্তু আমাদের চলমান দিনগুলো এতই ব্যস্ততামুখর যে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আর হয়ে ওঠে না। এমনিভাবে যে জীবন যতিহীন, শুধু একঘেয়ে ঘানি টেনে চলার মতো, সে জীবনের মূল্য কী আছে! ইংরেজ কবি ডব্লিউ এইচ ডেভিস লিখেছিলেন, What is this life if, full of care, We have no time to stand and stare. আমাদের জীবন এমনি বিড়ম্বনার শিকার।

বাংলাদেশের ভেতরে আমি পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছি। এগুলোর কোনোটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা, জুনিয়র হাইস্কুল, কোনোটি হাইস্কুল, কোনোটি কলেজ এবং সবক'টির শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়েও আমাকে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য পড়াশোনা ও গবেষণা করতে হয়েছে; কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্মৃতিকাতর করে না। তবে কিছু কিছু নামকরা অধ্যাপককে ঘিরে আমি যে সুখস্মৃতি অনুভব করি না তা-ও নয়। এদের মধ্যে অন্তত তিনজন তাদের গবেষণা উপলক্ষে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এসব বিদেশী শিক্ষকের কাছেও কল্পনাতীত স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি। তাদের মধ্যে অন্তত দুজন লোকান্তরিত হয়েছেন। তারা হলেন প্রফেসর রোজেনস্টাইন রোডান। ৮৭ বছর বয়সে প্রফেসর রোডান ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন অস্ট্রীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান। তাই তার ইংরেজি বলার ঢং ছিল ভিন্ন এবং আমাদের মতো দক্ষিণ এশীয়দের জন্য সহজবোধ্য। তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। এর আগে তিনি এমআইটিতেও পড়িয়েছেন। তিনি এককভাবে আমাদের যে কোর্সটি পড়াতেন তার জন্য সপ্তাহে একদিন ৩ ঘণ্টার ক্লাস নিতেন। কোর্সটির শিরোনাম ছিল Expansion of the world Economy. পড়াতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে রসিকতাও করতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, একবার তিনি পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং চট্টগ্রামেও গিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তার কাছ থেকে শুনেছি তিনি নেহেরুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন ভারতের সামরিক বাহিনীকে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করেন। তার যুক্তি ছিল সামরিক বাহিনীর লোকরা উৎপাদনশীল কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে না, জনগণের দেয়া করের অর্থ শুধু ভোগ করে। নেহেরু নাকি তাকে বলেছিলেন, প্রধান সেনাপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে তিনি তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। নেহেরু আর কখনই তাকে তার সিদ্ধান্ত খোলাখুলি জানাননি। কয়েকদিন পর প্রফেসর রোডান একটি চিঠি পেলেন, যাতে লেখা রয়েছে 'তার সার্ভিসের আর প্রয়োজন নেই এবং তিনি তার কর্মকালে যা কিছু করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।' স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নেহেরু সামরিক বাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হোক এমন কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। সামরিক বাহিনীকে জনগণের সঙ্গে মেলামেশা থেকে দূরে রাখতে পারলেই তার শৃংখলা অটুট থাকবে।

প্রফেসর রোডান খুবই ব্যতিক্রমধর্মী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১২টি ভাষা জানতেন। তার কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার আগে তিনি আমাদের জানালেন, আমরা এ ১২টি ভাষার যে কোনো একটি ভাষায় আমাদের উত্তরপত্র লিখতে পারব। প্রশ্ন থাকবে দুটি। যে কেউ ইচ্ছে করলে পুরো সময়ে একটি অথবা দুটি প্রশ্নেরই উত্তর লিখতে পারবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই গ্রেডে তারতম্য হবে না। অর্থাৎ যে একটি প্রশ্নের উত্তর বিশদভাবে লিখবে সে দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখার সমান গ্রেডই পাবে। উত্তরের গুণগত মানের তারতম্য অনুযায়ী গ্রেডে তারতম্য হবে। এমন কিছু কি আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ভাবা যায়? কোনো প্রফেসর যদি এরকম নিয়ম চালু করেন, তাহলে একে তুঘলকি কাণ্ড বলেই বিবেচনা করা হবে। ফাইনাল পরীক্ষার কয়েকদিন পর প্রফেসর রোডানের সেক্রেটারি আমাকে ফোন করলেন, যাতে আমি প্রফেসর রোডানের সঙ্গে দেখা করি। বেশ ভয়ে ভয়েই তার মুখোমুখি হলাম। তিনি আমাকে আমার লেখা উত্তরপত্রটি এগিয়ে দিলেন যার ওপর লেখা আছে, 'Congratulations'। গ্রেড পেয়েছি এ+। প্রফেসর রোডান আমাকে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। যাতে লেখা ছিল, 'Mahbub dominates over tools of economic analysis rather being dominated by them.' তিনি সেই প্রশংসাপত্রে আমার ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন এবং অর্থনীতির মধ্যে বিরল সংমিশ্রণ ঘটানোর ক্ষমতারও ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এভাবে শিক্ষাজীবনে শিক্ষকদের অনেক প্রশংসা অর্জনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার পিএইচডি সুপারভাইজার প্রফেসর কৃষ্ণা ভরদ্বাজ যিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি আমার থিসিস জমা নেয়ার দিনটিতে যেভাবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আমি যেদিন থিসিস জমা দিয়েছিলাম তার সপ্তাহখানেক আগে তিনি তার অফিসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তার এই অজ্ঞান হওয়ার মূলে ছিল মস্তিষ্কে টিউমার হওয়া। হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং সাবধানে থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল; কিন্তু তাকে তখনও মরণব্যাধিটি সম্পর্কে জানানো হয়নি। সে কারণেই হয়তো তিনি আমার ভারি ওজনের থিসিসটি নিয়ে আনন্দের আতিশয্যে এক অধ্যাপকের কক্ষ থেকে অন্য অধ্যাপকের কক্ষে ছুটে যাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, দেখো মাহবুব উল্লাহ কেমন চমৎকার কাজ করেছে। অধ্যাপকদের মধ্যে একজন প্রফেসর ভরদ্বাজকে এরকম ভারি ওজনের জিনিস টানাটানি করতে বারণ করার পরই তিনি নিবৃত্ত হলেন। উল্লেখ্য, আমার থিসিস ডিফেন্সের কয়েক মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। সম্ভবত আমি তার শেষ পিএইচডি ছাত্র। সমগ্র জীবনে এ ধরনের অনেক ছাত্রই তিনি তৈরি করেছেন। তিনি ছিলেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইকোনমিক স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন। মৃত্যুর আগেও তিনি রোটেশনে দ্বিতীয়বার এ সেন্টারের চেয়ারপারসন হয়েছিলেন। সেন্টারটি বিশ্বের নামজাদা অধ্যাপকদের জন্য খ্যাত।

আমি এখন অবসর জীবন কাটাচ্ছি। বাস করি রাজধানী ঢাকায়। এ ঢাকাতেই আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলাম ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। এ কলেজ থেকেই এইচএসসি মানবিক শাখায় আমি বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। ঢাকা কলেজে পড়ার দু'বছরের স্মৃতি আজও আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ কলেজেও শিক্ষকদের অপত্য স্নেহ পেয়েছি। যখনই ঢাকা কলেজের সামনের পথটি দিয়ে চলি তখনই গভীর ইচ্ছা জাগে আমার প্রিয় কলেজটিতে ঘুরে আসি; কিন্তু সাহস হয় না। সেখানে ঢোকার পর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব কিনা সেই শংকাও জাগে।

মেট্রিকুলেশন পাস করার পর আমার পিতা আমাকে কোন্ কলেজে ভর্তি করাবেন সে ব্যাপারে দোদুল্যমানতায় ভুগছিলেন। তিনি তখন কুমিল্লায় চাকরি করতেন। আমার কোন শাখায় পড়া উচিত সে ব্যাপারে তিনি তৎকালীন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের নামকরা অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শেষ পর্যন্ত আমার এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে তিনি আমাকে ঢাকায় পড়তে দিতে সম্মত হন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ ছিল না। সে সময় ঢাকায় দুটি কলেজ খুবই নামকরা। এগুলো হল ঢাকা কলেজ ও নটর ডেম কলেজ। শেষ পর্যন্ত ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ারই সিদ্ধান্ত হল। আমি আজও মনে করি সেই সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। সেদিন ঢাকা কলেজে ভর্তি না হলে প্রফেসর আবু রুশদ মতীন উদ্দিন, প্রফেসর শওকত ওসমান, প্রফেসর মোহাম্মদ নোমান, প্রফেসর সৈয়দ রফিক উদ্দিন আহমদ, প্রফেসর আশরাফ সিদ্দিকী, প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমদ, প্রফেসর এম আই চৌধুরী, প্রফেসর সৈয়দ আহমদ, প্রফেসর গোলাম রহমান খান, প্রফেসর আওলাদ হোসেন, প্রফেসর এজেডএম শামসুল আলম, প্রফেসর আবদুল ওহাব, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, প্রফেসর কামাল উদ্দিন ও প্রফেসর ওবায়দুল হকের মতো শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসতে পারতাম না। পরলোকগত আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভী রহমানের পিতা ছিলেন প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক। তিনি বেশ কদিন নিজ বাসগৃহেও আমাকে পড়িয়েছেন। তারই পরামর্শে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি Oxford Companion to English Literatiure গ্রন্থটির পুরোটি না হলেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত কবি ও লেখকদের সম্পর্কে পড়েছিলাম। কিছুদিন না যেতেই আমি প্রফেসর আশরাফ সিদ্দিকীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও লোকসাহিত্য বিশারদ। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকসাহিত্যে পিএইচডি করেছিলেন। প্রফেসর সিদ্দিকী তার লেকচারের শুরুতে আগের ক্লাসে দেয়া লেকচারের সারাংশ আমাকে দিয়ে বলাতেন। জানি না এমন রীতি এখন ঢাকা কলেজে চালু আছে কিনা। প্রফেসর আবু রুশদ মতীন উদ্দিন অক্সফোর্ড থেকে এমএ করেছিলেন। তিনিও ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। শীর্ণকায় ঋজুদেহী এই মানুষটি অতি স্পষ্ট ও গুরুগম্ভীর উচ্চারণে ইয়েটস ও স্পেন্ডারসহ আধুনিক ইংরেজ কবিদের কবিতার পাঠ দিতেন। অন্যদিকে ভূগোলের শিক্ষক প্রফেসর এমআই চৌধুরী দেশের ভূগোলটাকে কলেজের ল্যাবরেটরির মধ্য নিয়ে এসেছিলেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করা এই মানুষটি দেশের নানা প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ভূগোলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ও তার সহকর্মীরা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে অনেক উঁচু মানের গ্রন্থ পাঠ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এসব গ্রন্থকারের মধ্যে ছিলেন ওরচেস্টার, মংকহাউস, ফিলিপলেক, কেন্ড্রু ট্রাওয়ার্থা, এলডি স্ট্যাম্প, নাফিস আহমদ প্রমুখ। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসেই আমাদের মাস্টার্স পর্যায়ের বই পড়তে হতো। এর জন্য আমরা কখনও ভারাক্রান্ত বোধ করিনি, বরং আনন্দ পেয়েছি ঢের। ওয়াগনারের কন্টিনেন্টাল ড্রিফট থিয়োরি এবং এন্টিপোডের থিয়োরি আমাদের চমৎকৃত করত। সুসাহিত্যিক শওকত ওসমান বঙ্কিম চন্দ্রের 'বিড়াল' পড়াতে গিয়ে কখনও শেষ করেননি। চলে গিয়েছিলেন সামাজিক ভাষাতত্ত্বের জগতে। পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হচ্ছে না বলে আমাদের কোনো ক্ষোভ ছিল না। আমরা তার বক্তৃতাকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাড়তি পাওনা বলে মনে করতাম। বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি এবং সেগুলোর সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি আমাদের আলোকিত করে তুলেছিলেন। সেদিনকার ঢাকা কলেজ মাত্র দু'বছরের মধ্যে আমাদের নতুন মানুষে পরিণত করেছিল। অবশ্য এটা সম্ভব হতো না যদি আমরা স্কুলেও এ ধরনের যোগ্য শিক্ষক না পেতাম। এ ঢাকা কলেজে এখন সে রকম জ্ঞানী-গুণী শিক্ষক আছেন কিনা বলতে পারি না। আমাদের সময়ে ঢাকা কলেজেও ছাত্র রাজনীতি ছিল। ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকেই। কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনও হয়েছিল। স্পটলাইট নামে কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হতো। হোস্টেলে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের প্রচলন ছিল। কলেজ মাঠে খেলাধুলাও হতো। শিক্ষকদের কেউ কেউ ছাত্রদের সঙ্গে টেনিসও খেলতেন। সব মিলিয়ে আমাদের ঢাকা কলেজের জীবন ছিল অনেক সুখস্মৃতির আকর। রাত ১০টায় কলেজের ওপারে চিটাগাং রেস্টুরেন্টে এসে দই-বুন্দিয়া খেয়ে কলকাতা বেতারের গানের আসর শোনায় ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ।

সেই ঢাকা কলেজ কি আজ হারিয়ে গেছে? পত্রিকায় যেসব খবর পড়ি তাতে মনটা খুব ভারি হয়ে ওঠে। এমনটি তো কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কল্পনাও করা যায়নি দেশের এই শ্রেষ্ঠ কলেজটির চেহারা এরকম কলুষিত হয়ে উঠবে। একটি পত্রিকা ২২ জানুয়ারিতে শিরোনাম করেছে, 'ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের বিরোধ, গুলি।'

পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা কলেজ শাখার নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জনা যায়, ঘটনায় জড়িত দুটি পক্ষই কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইনের অনুসারী। গত বছরের ১৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নূরে আলম ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে ঢাকা কলেজ শাখার কমিটি গঠন করা হয়। ওইদিন রাতে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে যুগ্ম আহ্বায়ক হীরন ভূঁইয়া, শেখ রাসেল, রাসেল মাহমুদসহ আরও কয়েকজন তাদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেননি। তারা শুধু নূরে আলমকে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে থাকতে দেন। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ছাত্র বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় নূরে আলমের অনুসারীরা অস্ত্র, চাপাতি, লাঠিসোটা নিয়ে পাঁচটি ছাত্রাবাসে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। তাদের মারধর করেন। এ সময় অন্তত ২০ থেকে ২৫টি ফাঁকা গুলির শব্দ শোনা গেছে। পরে হীরন ভূঁইয়া, শেখ রাসেল, রাসেল মাহমুদসহ তাদের অনুসারী নেতাকর্মীরা হল ছেড়ে পালিয়ে যান। এক পর্যায়ে নূরে আলমের অনুসারীরা উত্তর ছাত্রাবাসের সামনে থাকা সাতটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ক্যাম্পাসে প্রতিটি ছাত্রাবাসের দখল নেন তারা। ঢাকা কলেজের এই চেহারার সঙ্গে আমাদের কালের ঢাকা কলেজের কত ফারাক। মনে আশা ছিল স্বাধীন দেশের ঢাকা কলেজ হবে পাকিস্তানি শাসনামলের ঢাকা কলেজের তুলনায় অনেক অনেক বেশি উন্নত ও প্রাগ্রসর; কিন্তু কী কারণে আমাদের আশা ভঙ্গ হল? কে বা কারা দায়ী এর জন্য? তরুণরা পথভ্রান্ত হয় যতটা না নিজেদের কারণে, তার চেয়েও বেশি অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ সামনে না থাকার ফলে। রাজনীতির চর্চা অনুসরণীয় আদর্শ সৃষ্টি করে; কিন্তু রাজনীতি যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে তাহলে আদর্শ হারিয়ে যায় কিংবা অনেকের চোখে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আজকাল আদর্শবাদী মানুষদের বোকা বলে ব্যঙ্গ করা হয়। শুধু ভাবি, এই বোকা মানুষগুলো কবে আমাদের দেশে অনুকরণীয় মানুষরূপে গণ্য হব। কতদূরে সেই দিন?

মনে আশা ছিল স্বাধীন দেশের ঢাকা কলেজ হবে পাকিস্তানি শাসনামলের ঢাকা কলেজের তুলনায় অনেক অনেক বেশি উন্নত ও প্রাগ্রসর; কিন্তু কী কারণে আমাদের আশা ভঙ্গ হল? কে বা কারা দায়ী এর জন্য? তরুণরা পথভ্রান্ত হয় যতটা না নিজেদের কারণে, তার চেয়েও বেশি অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ সামনে না থাকার ফলে। রাজনীতির চর্চা অনুসরণীয় আদর্শ সৃষ্টি করে; কিন্তু রাজনীতি যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে তাহলে আদর্শ হারিয়ে যায় কিংবা অনেকের চোখে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আজকাল আদর্শবাদী মানুষদের বোকা বলে ব্যঙ্গ করা হয়। শুধু ভাবি, এই বোকা মানুষগুলো কবে আমাদের দেশে অনুকরণীয় মানুষরূপে গণ্য হব। কতদূরে সেই দিন?

ড. মাহবুব উল্লাহ : *অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ*